বিপ্লবী

গণলাইন

বিশেষ সংখ্যা ২০১৫

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ১

সম সময়

কৃষির উপর আক্রমণ ধামাচাপা দেওয়া যাবে না
অপর্ণা ২

মুন্নারের মহিলা শ্রমিকদের আন্দোলনের শিক্ষা
ডি. ভি. কৃষ্ণ ৮

গোহত্যা-গোমাংস এবং......
অজিত রায় ১২

জমি অধিগ্রহণ, রাষ্ট্র ও শ্রমজীবী মানুষ—
তপন রায় ২০

সিলিকন উপত্যকার শিক্ষাবিদদের আহ্বান ৩০

ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নয়া ঔপনিবেশিক প্রভাব
সুজন বসু ৩২

কলকাতার বস্তি ঃ একটি পর্যালোচনা
সৌমেন বসু ৩৪

আমন্ত্রিত রচনা

স্বাস্থ্যের জন্য সংগ্রাম — ড. পূণ্যব্রত গুণ ৩৮
আমরা মধ্যবিত্তরা — ড. বিকাশ বাজপেয়ী ৪৮

সংস্কৃতি

নাটক ঃ মহেশ — আশিস দাশগুপ্ত ৫০

বিতর্ক

ভারতবর্ষে শ্রেণিসংগ্রাম গড়ার নামে নয়া অর্থনীতিবাদ— অমৃত সেন ৫৯
'চিন্তন'-এর কমিউনিস্ট পার্টি - একটি মার্কসবাদ বিরোধী অবস্থান— অমিত চক্রবর্তী ৬৬
প্রসঙ্গ ঃ লালগড় আন্দোলন— যোগেন বর্মন ৭৬

স্বাস্থ্যের অধিকারের জন্য সংগ্রাম

ডা পুণ্যব্রত গুণ

আজ থেকে ৩২ বছর আগে ১৯৮৩-তে পশ্চিম বাংলার জুনিয়র ডাক্তাররা স্লোগান তুলেছিল — 'স্বাস্থ্য কোন ভিক্ষা নয়, স্বাস্থ্য আমাদের অধিকার।'

আমাদের দেশে স্বাস্থ্যের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত নয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র সংজ্ঞা অনুযায়ী 'স্বাস্থ্য কেবল অসুস্থতার অনুপস্থিতি নয় স্বাস্থ্য মানে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে ভালো থাকা'।

ভারতের মানুষ ভালো নেই

- দেশে ঋণ নেওয়ার দ্বিতীয় অন্যতম কারণ চিকিৎসার খরচ।
- হাসপাতালে ভর্তির খরচ মেটাতে প্রতি বছর প্রায় এক কোটি ভারতবাসী দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে যান।
- হাসপাতালে যাঁরা ভর্তি হন, তাঁদের এক-তৃতীয়াংশকে ভর্তির খরচ মেটাতে হয় ধার করতে হয় নয়তো সম্পত্তি বিক্রি করতে হয়।

খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের মতই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা। জমির অধিকার, জলের অধিকার, কর্ম-সংস্থানের অধিকারের মত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাপরিষেবার অধিকারও জীবনের বিষয়, কখনও কখনও বাঁচা-মরার প্রশ্ন। কিন্তু বাকী বিষয়গুলোর মত চিকিৎসাপরিষেবার অপ্রতুলতা সব সময় মানুষকে প্রভাবিত করে না। কারণ বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন খাদ্য-জল-বাসস্থান দরকার, চিকিৎসার দরকার হয় না সব সময়। কিন্তু চিকিৎসার অপ্রতুলতায় মানুষ যখন প্রভাবিত হন তখন তাঁর ক্ষোভ চিকিৎসক-চিকিৎসাকর্মী-চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানের ওপর ফেটে পড়ে, অনেক সময় অন্যায্য ভাবেও।

আরও কিছু তথ্য মনে রাখার মত

- চিকিৎসা পরিষেবায় বেসরকারীকরণ যে সব দেশে বেশী, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম আমাদের দেশ।
- জিডিপি-র মাত্র ১.০৪% সরকার স্বাস্থ্যখাতে খরচ করে। চিকিৎসার জন্য বেশির ভাগ খরচটা রোগীকে নিজের পকেট থেকে করতে হয়।
- বেসরকারী চিকিৎসা পরিষেবা ক্ষেত্রের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে।
- শহর ও গ্রামের মধ্যে পরিষেবায় বিপুল ফারাক। দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৭০% থাকেন গ্রামাঞ্চলে, অথচ সেখানে পাশ করা ডাক্তারদের মোটামুটি ৩০% থাকেন। বাকী ৭০% ডাক্তার শহর-কেন্দ্রিক।
- চিকিৎসা পরিষেবা প্রধানত হাসপাতাল-কেন্দ্রিক, ডাক্তার-কেন্দ্রিক।
- সরকারী চিকিৎসা পরিষেবার পরিমাণ ও গুণমান-দুই-ই অপর্যাপ্ত। ১৯৯১-এ দেশের সরকার আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও বিশ্ব ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া শুরু করার পর থেকে ঋণের শর্ত অনুযায়ী স্বাস্থ্য-শিক্ষার মতো পরিষেবা-ক্ষেত্রগুলো থেকে সরে এসে দ্রুত গতিতে জায়গা করে দিচ্ছে স্বাস্থ্য-ব্যবসায়ীদের।

দেশবাসীর দুর্দশা কমাতে মহানুভব ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নিঃশুল্ক ডাক্তারখানা বা হাসপাতাল খুলেছেন, কোন রাজনৈতিক দল বা অ-রাজনৈতিক সংগঠন বন্যা-খরা-মহামারীর সময় চিকিৎসা ত্রাণ চালিয়েছেন—এমনটা দেখা গেলেও স্বাস্থ্যের দাবি নিয়ে আন্দোলনের ইতিহাস বেশি দিনের নয়, বছর ৩০-৩৫ এ ধরণের আন্দোলনের বয়স।

বামপন্থী দলগুলোও স্বাস্থ্যের বিষয়গুলোকে আন্দোলনের বিষয় হিসেবে নিয়েছেন এমনটা নয়—অথচ বহু ডাক্তার বামপন্থী দলগুলোর সদস্য বা সমর্থক হিসেবে ছিলেন বা আছেন। তাঁদের কাছ থেকে উচ্চ হারে লেভি নেওয়া, তাঁদের দিয়ে সংগঠনের সদস্য-সর্মথকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করানো, কখনও সখনও তাঁদের দিয়ে আন্দোলনের সময় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় চিকিৎসা শিবির চালানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে দলগুলো। তাঁদের স্বাস্থ্য আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে ব্যবহার করা হয় নি বললেই চলে।

স্বাস্থ্য ভিক্ষা নয়, অধিকার — সেই অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে হবে — এই ধারণা থেকে আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে ৭০ দশকের মাঝামাঝি, ৮০-র দশকের শুরু থেকে। ভারতের নানা কোণে চলা এই সব আন্দোলনগুলো নিয়ে এই আলোচনা — উদ্দেশ্য আন্দোলনগুলোর ইতিবাচক-নেতিবাচক

দিকগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য'-এর লক্ষ্যে এগিয়ে চলা।

জনস্বাস্থ্য আন্দোলন মানুষের স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নয়নকল্পে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর পক্ষে, কিন্তু জনস্বাস্থ্য আন্দোলন সাধারণ ভাবে মনে করে —

- কেবল প্রযুক্তি দিয়ে সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধান করা যায় নি।
- বিশেষজ্ঞ (এই ক্ষেত্রে চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মী বা স্বাস্থ্যকর্মী) জনগণের হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।
- জনগণ চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার্য্য বস্তু নন, বরং জনগণেরই চিকিৎসা-পরিষেবার নির্ণায়ক শক্তি হওয়ার কথা।

ভারতে এ যাবৎ ঘটে আসা স্বাস্থ্য আন্দোলনগুলোকে যদি আমরা দেখি, তাহলে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ধারা / ঘটনা দেখা যায় —

- গণবিজ্ঞান আন্দোলনের স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রয়াস
- ওষুধনীতি নিয়ে প্রচার
- নারীবাদী আন্দোলনের স্বাস্থ্য প্রচার
- ভূপালের গ্যাসপীড়িতদের আন্দোলন
- ডাক্তারদের সংগঠন
- মেডিকেল ছাত্র ও জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন
- পেশাগত রোগ নিয়ে প্রচার ও আক্রান্তদের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে আন্দোলন
- জনস্বাস্থ্য অভিযান
- পত্র-পত্রিকা
- গণসংগঠনের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য আন্দোলন।

একেক করে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক।

গণবিজ্ঞান আন্দোলনের স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রয়াস

গণবিজ্ঞানের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য সচেতনতার উল্লেখযোগ্য কাজ যে সংগঠনগুলো করেছে তাদের মধ্যে আছে —

- কেরালার কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ, মুলত সিপিআইএম-প্রভাবিত।
- মহারাষ্ট্রের লোক বিদ্যান সংঘঠনা, শ্রমিক মুক্তি দল-প্রভাবিত।
- পশ্চিমবাংলায় তৃতীয় ধারার শক্তি পরিচালিত বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন, অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত পত্রিকার নামে যাদের পরিচয় - উৎস মানুষ, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, ইত্যাদি। আশির দশক ছিল এই সংগঠনগুলোর কাজের গৌরবোজ্জ্বল সময়। সে সময়ে এই সংগঠনগুলো মিলে গড়ে তোলে গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ। পরবর্তী কালে সিপিআইএম-প্রভাবিত সরকারী মদতপুষ্ট পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ-এর সামনে এগুলো ক্ষীণবল হয়ে পড়ে। এখনও যে বিজ্ঞান-সংগঠনগুলো গণস্বাস্থ্য নিয়ে অপেক্ষাকৃত সক্রিয় তাদের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগণা, নদীয়ার কতগুলো সংগঠন অন্যতম।

ওষুধনীতি নিয়ে প্রচার

১৯৭৫-এ জয়শুকলাল হাথীর নেতৃত্বাধীন সংসদীয় কমিটি প্রকাশিত রিপোর্ট বলে ১১৭ টা মাত্র ওষুধ ভারতের জন্য অত্যাবশ্যক। কমিটি এই ওষুধগুলোর উৎপাদন নিশ্চিত করার সুপারিশ করে, ওষুধের ব্রান্ড নাম বা বাজারী নামের বদলে জেনেরিক নাম বা বৈজ্ঞানিক নাম ব্যবহারের সুপারিশ করে। যাতে জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধগুলো মানুষের আয়ত্তের মধ্যে থাকে তাই মূল্য-নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করা হয়। হাথী কমিটি চেয়েছিল পাব্লিক সেক্টর যেন ওষুধ উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা নেয়। দেশীয় ওষুধ-কোম্পানীগুলোর বিকাশের জন্য কিছু ওষুধ-উৎপাদন কেবল দেশীয় কোম্পানীগুলোর জন্য সংরক্ষিত রাখার কথা বলা হয়। ওষুধ-শিল্পে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর ভূমিকার নিন্দা করে কমিটি, ওষুধ-কোম্পানীগুলোতে বিদেশী বিনিয়োগের মাত্রা তৎক্ষণাৎ কমিয়ে ৪০% করা এবং তারপর কমিয়ে ২৬% করার কথা বলা হয়, এমনকি বিদেশী ওষুধ-কোম্পানীগুলোর জাতীয়করণের পক্ষে ছিল হাথী কমিটি।

আশির দশকের শুরুতে প্রতিবেশী বাংলাদেশের সামরিক স্বৈর সরকার এক জনমুখী পদক্ষেপ নেয়, বাংলাদেশের বাজার থেকে অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর সব ওষুধ নিষিদ্ধ করে। সত্তরের দশকের শেষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অত্যাবশ্যক ওষুধের প্রথম তালিকা প্রকাশ করে, সে তালিকায় ওষুধ ছিল শ-দুয়েক। এই ওষুধগুলো দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের প্রায় সমস্ত রোগ চিকিৎসা সম্ভব। অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা ছিল ১৯৭৭-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-ঘোষিত '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য'-এর লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অথচ ভারতের বাজারে তখন হাজার ষাটেক ওষুধের ফরমুলেশন।

জনমুখী জাতীয় ওষুধনীতির দাবিতে গড়ে ওঠে অল ইন্ডিয়া ড্রাগ একশন নেটওয়ার্ক (AIDAN)। নানা রাজ্যে AIDAN এর শাখা সংগঠনগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ড্রাগ

একশন ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ (DAF-WB)। ড্রাগ একশন ফোরাম স্লোগান তোলে 'মানুষের জন্য ওষুধ না ওষুধের জন্য মানুষ।' একই নামে ফোরামের এক পুস্তিকা প্রচুর জনপ্রিয় হয়। পুস্তিকাটার হিন্দী অনুবাদও করা হয়, পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারে প্রচারের জন্য। ডাক্তারদের ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারে শিক্ষিত করতে এক দ্বিমাসিক জার্নাল বার করা হতে থাকে --- ড্রাগ ডিজিজ ডক্টর (DDD)। ৯০-এর দশকের মাঝামাঝি অবশ্য DAF দুর্বল হয়ে পড়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্বের সংঘাতে।

ইস্ট্রোজেন-প্রোজেস্টেরন-এর উচ্চমাত্রায় মিশ্রণের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা করে AIDAN। AIDAN - র জনস্বার্থ মামলার চাপে সরকার ৭০টারও বেশী ক্ষতিকর ওষুধ নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়।

যুক্তিসঙ্গত জেনেরিক ওষুধ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কিছু উদ্যোগও শুরু হয়েছিল এই আন্দোলনের পাশাপাশি। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বরোদার LOCOST এবং কলকাতার কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট মেডিসিনাল ইউনিট (CDMU)। LOCOST নিজস্ব কারখানায় জেনেরিক নামের কিছু অত্যাবশ্যক ওষুধ তৈরী করে। CDMU ওষুধ কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে দর কষাকষি করে ওষুধ কিনে কম দামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে সরবরাহ করে।

AIDAN এর প্রধান দুর্বলতা হল গণ আন্দোলনের সঙ্গে ওষুধনীতির আন্দোলনকে যুক্ত করার চেষ্টা না করে আদালতে মামলা আর সরকারী দপ্তরে আবেদন-নিবেদনে নিজেকে সীমিত রাখা।

তবু এদের কাজের ইতিবাচক প্রভাবের কথা বলতেই হয়। ২০১৩-এ কেন্দ্র সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ৩৪৮ টা অত্যাবশ্যক ওষুধের ওপর মূল্যনিয়ন্ত্রণ লাগু করে। এমনটা সম্ভব হয়েছিল তারও বছর দশেক আগে AIDAN, LOCOST, জনস্বাস্থ্য সহযোগ-এর মতো কতগুলো সংগঠনের করা জনস্বার্থ মামলার ফলে।

নারীবাদী আন্দোলনের স্বাস্থ্য প্রচার

হায়দরাবাদের স্ত্রীশক্তি সংগঠন, দিল্লীর সহেলীর মত নারীবাদী সংগঠনগুলো Depo-provera, NET-EN, Nor-Plant—এর মত ক্ষতিকর জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলোর বিরুদ্ধে জোরদার প্রচার চালিয়ে সরকারকে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে এগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করায় সফল ভাবে বাধা দেয়। মহিলাদের জননস্বাস্থ্যের বিষয়গুলোকে ধোঁয়াশামুক্ত করার প্রয়াস, স্ত্রীভ্রূণ-হত্যার বিরুদ্ধে প্রচার এদের উল্লেখযোগ্য অন্য কাজ।

এই সংগঠনগুলোর মূল দুর্বলতা হল — এরা ফান্ডিং এজেন্সির ফান্ড নিয়ে কাজ করে এবং এদের কাজ ছোট-ছোট এলাকায় সীমিত।

ভূপালের গ্যাসপীড়িতদের আন্দোলন

ভারতের স্বাস্থ্য আন্দোলনের ইতিহাসে আলাদাভাবে উল্লেখের দাবি রাখে ভূপালের গ্যাসপীড়িতদের আন্দোলন। ২-৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৪-তে ইউনিয়ন কার্বাইডের গ্যাসকাণ্ডের পর গ্যাসপীড়িতরা যে আন্দোলন শুরু করেন তাতে ছিল তথ্যের অধিকারের দাবি—বিষগ্যাসে কি কি উপাদান ছিল, মানব ও মানবেতর প্রাণীর শরীরে তাদের কিইবা প্রভাব, বিষের প্রতিষেধকই বা কি সে সম্বন্ধে গ্যাসপীড়িতরা জানতে চান। আর ছিল যথাযথ চিকিৎসা, বিষের উচিত প্রতিষেধকের দাবি। গ্যাসপীড়িতদের যে সংগঠন এই আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল তা হল জাহরিলী গ্যাস কাণ্ড সংঘর্ষ মোর্চা (ZGKSM)। এই সংগঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে মধ্যপ্রদেশে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কয়েকজন কর্মী ও এসইউসিআই-এর কিছু সংগঠক। এছাড়া ছিল সিপিআই-প্রভাবিত নাগরিক রাহত আউর পুনর্বাস কমিটি (NRPC)। স্বাস্থ্য নিয়ে সমীক্ষার কাজ করে চিকিৎসকদের সংগঠন মেডিকো ফ্রেন্ডস সার্কেল (MFC)।

১৯৮৫-র ৩রা জুন গ্যাসপীড়িতরা ইউনিয়ন কার্বাইড প্রাঙ্গণকে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করে সেখানে এক ক্লিনিকের কাজ শুরু করেন। ZGKSM ও NRPC ছাড়া বম্বের ট্রেড ইউনিয়ন রিলিফ ফান্ড (TURF) ও ইউনিয়ন কার্বাইড কর্মচারী সংঘ (UCKS) যৌথভাবে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র নামে এই ক্লিনিক চালাত।

এই ক্লিনিকে ডাক্তার হিসেবে কাজ করতেন মূলত পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা DAF-WB ও মেডিক্যাল কলেজ ডেমোক্রাটিক স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন (MCDSA) - এর সঙ্গে যুক্ত জুনিয়র ডাক্তাররা। তাঁরা গ্যাসপীড়িতদের বিষের প্রতিষেধক সোডিয়াম থায়োসালফেট ইঞ্জেকশন লাগাতেন এবং রোগীদের উপসর্গের পরিবর্তন নথিভুক্ত করতেন। ইউনিয়ন কার্বাইডের

বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগাড় হচ্ছিল, তাতে সন্ত্রস্ত হয়ে ইউনিয়ন কার্বাইডের দোসর সরকার আক্রমণ নামিয়ে আনে সপ্তাহ তিনেকের মাথায়। ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীরা গ্রেপ্তার হন, স্বাস্থ্য কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। আবার মাস দেড়েক বাদে DAF, MFC, মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার, শহীদ হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তাররা পর্যায়ক্রমে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র চালান কয়েক মাস। এর মাঝে ZGKSM-NRPC-র বিরোধে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র ভেঙ্গে তৈরী করতে হয় জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ভূপাল।

এরপর ZGKSM এস ইউ সি আই-এর কুক্ষিগত হয়, স্বেচ্ছাসেবীদের মোর্চায় একঘরে করে দেওয়া হয়। শেষে ZGKSM ইউনিয়ন কার্বাইডের সঙ্গে ভারত সরকারের অন্যায় চুক্তি সমর্থন করে গ্যাস-পীড়িতদের আস্থা হারায়। গ্যাস-পীড়িতদের নেতৃত্ব দিতে এবার এগিয়ে আসে গ্যাসপীড়িত মহিলা উদ্যোগ সংগঠন। ZGKSM এর সহযোগী বুদ্ধিজীবীদের একাংশ গঠন করেন ভূপাল গ্রুপ ফর ইনফরমেশন এণ্ড একশন। পরে গঠিত হয় সম্ভাবনা ট্রাস্ট।

সম্ভাবনা ট্রাস্ট এলোপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, যোগের সমন্বয়ে গ্যাস-পীড়িতদের চিকিৎসা ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত গবেষণার কাজ চালাচ্ছে — তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আমাদের অজানা। এছাড়া সম্ভাবনা ট্রাস্ট কোন ফান্ডিং এজেন্সির অর্থগ্রহণ না করলেও, প্রায় পূর্ণত দান (অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশী বন্ধুদের দান)-এর ওপর নির্ভরশীল, এটাও এর দুর্বলতার দিক।

ডাক্তারদের সংগঠন - মেডিকো ফ্রেন্ডস সার্কেল

সত্তর দশকের প্রথমার্ধে জয়প্রকাশের আদর্শে অনুপ্রাণিত কিছু ডাক্তার এই সমন্বয় গড়ে তোলেন। বছরে দুবার অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক সভায় এরা স্বাস্থ্যনীতি-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। MFC Bulletin নামে এক বুলেটিনের মাধ্যমে মতামত আদান-প্রদান করেন।

এঁদের উল্লেখযোগ্য কিছু প্রকাশনা —

1) Health Care : Which Way to Go?
2) In Search of Diagnosis
3) Under the Lense
4) Medical Education Re-examined

MFC র উদ্যোগ ভূপালের গ্যাসপীড়িতদের স্বাস্থ্য-সমীক্ষা হয় ১৯৮৬ এবং ১৯৮৯ - এ। গুজরাটের দাঙ্গা-পরবর্তী ত্রাণ-শিবিরগুলোতে এঁদের উদ্যোগে চিকিৎসা-ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়।

MFC-র দুর্বলতার দিক হল প্রথম অবস্থায় এর সদস্যরা প্রায় সবাই গণ-সংগঠন গণ-আন্দোলনের কর্মী হলেও এখন তাঁরা প্রায় সবাই ফান্ডেড এন জি ও - র কর্মী বা কর্মকর্তা।

মেডিকেল ছাত্র ও জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন

এই পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের মেডিকেল ছাত্র ও জুনিয়র ডাক্তারদের কথা বলব।

● ১৯৭৩-হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও ভাতা-বৃদ্ধির দাবিতে মেডিকেল ছাত্র ও জুনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলন করেন।

● ১৯৭৪ — MFC-র বার্ষিক সভায় বাংলার মেডিকেল ছাত্ররা অংশ নেন।

● ১৯৭৪ — সরকারী ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের ৪১ দিন ব্যাপী ধর্মঘট হয় নীতি-নির্ধারণে আমলাদের বদলে প্রযুক্তিবিদদের গুরুত্ব দেওয়ার দাবিতে।

● ১৯৭৫ — বাঁকুড়ার খরা-ত্রাণে মেডিকেল ছাত্ররা।

● ইমার্জেন্সির কালো দিনগুলোতে নিজেদের সংঘবদ্ধ রাখা ও মেহনতী মানুষের পাশে থাকার জন্য মেডিকেল কলেজ সোশ্যাল সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন গঠন করা হয়, শিবপুরের চওড়া বস্তিতে সাপ্তাহিক শিবির চলে বেশ কয়েক বছর।

● ১৯৭৮ — অন্ধ্রের সাইক্লোন-পীড়িত, মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের পাশে মেডিকেল ছাত্ররা।

● ১৯৮০ — মেডিকেল কলেজ ও আর জি করে হাসপাতাল আন্দোলন চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবিতে।

● ১৯৮৩ ও ১৯৮৬ তে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন অল বেঙ্গল জুনিয়র ডাক্তার ফেডারেশন (ABJDF) এর নেতৃত্বে, এই আন্দোলনের প্রধান দাবিগুলো ছিল —

১) ২৪ ঘন্টা এক্স-রে, ইসিজি, বায়োকেমিস্ট্রি, প্যাথোলজি, ব্লাড ব্যাংক
২) বেড সংখ্যাবৃদ্ধি
৩) কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি
৪) টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
৫) জুনিয়র ডাক্তারদের প্রশিক্ষণান্তে কর্মসংস্থান
৬) ভাতা বৃদ্ধি

এই আন্দোলনকে ভাঙতে ABJDF ভেঙ্গে শাসক দলের পেটোয়া জুনিয়র ডক্টরস' কাউন্সিল গড়ে তোলা হয়, JDC-র সদস্যদের মেডিকেল কলেজগুলোতে বসিয়ে দেওয়া হয়

আন্দোলন ভাঙ্গার দায়িত্ব দিয়ে। সরকারী ডাক্তারদের একমাত্র সংগঠন হেলথ সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন (HSA) ABJDF আন্দোলনকে সমর্থন করায় ট্রান্সফার-প্রোমেশনের লাঠি ও গাজর দেখিয়ে তৈরী করা হয় এ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস (AHSD)।

তাহলেও এ আন্দোলন ব্যর্থ হয় নি, সাময়িক ভাবে হলেও সরকার সরকারী হাসপাতালে ওষুধ সরবরাহ বাড়াতে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধা বাড়াতে বাধ্য হয়।

এছাড়া আরেকটা দিকও উল্লেখ করার মত — শহীদ হাসপাতাল, বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতাল, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের মত জনস্বাস্থ্য কর্মসূচীগুলোর সংগঠকের ভূমিকা যাঁরা পালন করছেন, তাঁরা প্রায় সবাই-ই ABJDF আন্দোলনের ফসল।

এই আন্দোলনই স্লোগান তুলেছিল — স্বাস্থ্য কোনও ভিক্ষা নয়, স্বাস্থ্য আমাদের অধিকার।

পেশাগত রোগ নিয়ে প্রচার ও আক্রান্তদের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে আন্দোলন ও প্রচার আন্দোলন

- Occupational Health and Saftey Centre
- PRIA, নয়াদিল্লী
- খেড়ুত মজদুর সংঘ, মধ্যপ্রদেশ
- People's Training & Research Centre, গুজরাট
- OSHAJ, ঝাড়খণ্ড
- PRASAR, দিল্লী
- টপ কোর্য়াক, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ
- নাগরিক মঞ্চ, কলকাতা

এই সংগঠনগুলো পত্র-পত্রিকা বার করে জনসচেতনতা তৈরী করা, আদালতে মামলা করে ক্ষতিপূরণ আদায় করার মত কাজ করে।

জনস্বাস্থ্য অভিযান

১৯৭৭-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা '২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য'-এর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিল। ২০০০-র সালের দোরগোড়ায় পৌঁছে যখন দেখা গেল সকলের জন্য স্বাস্থ্য তো দূরের কথা বরং সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে, চিকিৎসা ব্যবসায় বেসরকারী পুঁজির রমরমা বাড়ছে তখন ২০০০ সালে গঠিত হল জনস্বাস্থ্য অভিযান। এতে MFC-র সদস্য বেশ কিছুজন সংগঠক হিসেবে থাকলেও মূল রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ছিল সিপিআইএম তার নানা গণ-সংগঠনের আড়ালে। (যেজন্য পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য আন্দোলনে কর্মরত অনেক সংগঠনের কোনটাই জনস্বাস্থ্য অভিযানে স্থান না পেয়ে কেবল স্থান পায় সরকারী গণ-বিজ্ঞান সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ)।

২০০০-এর ডিসেম্বরে যুবভারতীতে ২ দিনের পিপলস হেলথ এসেম্বলীতে সারা ভারতের প্রতিনিধিরা আলাপ-আলোচনা করেন। তারপর ঢাকায়।

পরবর্তী কালে সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে জনশুনানীর আয়োজন করে।

জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (NRHM)-এর ওপর নজরদারীকেও এরা কাজ হিসাবে নিয়েছে।

NRHM-এর অন্তর্গত গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণের এক পাইলট প্রোজেক্ট ছত্তিশগড়ে চালান জনস্বাস্থ্য অভিযানের অন্যতম সংগঠক ডা বিনায়ক সেন। সেই স্বাস্থ্যকর্মীরা মিতানিন নামে পরিচিত।

জনস্বাস্থ্য অভিযানের অন্যান্য সদস্য-সংগঠন অনেকে NRHM-এর গ্রামীণ মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী ASHA (Accreditated Social Health Activist) ট্রেনিং-এর কাজে লিপ্ত আছেন।

জনস্বাস্থ্য অভিযান ব্যবস্থা পরিবর্তনের ঘোষিত লক্ষ্যে ব্যবস্থার সঙ্গে লিপ্ত হওয়ার যে পন্থা নিয়েছে তাতে ব্যবস্থার জনমুখী পরিবর্তন হবে, না ব্যবস্থা জনস্বাস্থ্য অভিযানকে গিলে খাবে তা নিয়ে সন্দেহ ছিল আগে থেকেই। এখন দেখা যাচ্ছে জনস্বাস্থ্য অভিযানের অধিকাংশ ঘটকের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই বাস্তব হয়েছে, তারা এখন ব্যবস্থার অঙ্গ বললেই চলে।

পত্র-পত্রিকা

স্বাস্থ্য আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বেশ কয়েকটা পত্র-পত্রিকা।

■ MFC Bulletin, Issues in Medical Ethics, Radical Journal of Health, Doctors' Dialogue, ইত্যাদি প্রধানত তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যম।

■ Drug, Disease, Doctor, BODHI, Rational Drug

Bulletin মূলত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসার রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত করানোর লক্ষ্যে প্রকাশিত।

■ Health for the Millions, Health Action, অসুখ বিসুখ, সোসাল ফার্মাকোলজি বুলেটিন, স্বাস্থ্যের বৃত্তে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত।

গণ সংগঠনের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য আন্দোলন

এই ধারায় উল্লেখ করার মত ছত্তিশগড় মাইনস শ্রমিক সংঘ ও ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা পরিচালিত শহীদ হাসপাতাল আন্দোলন, ইন্দো-জাপান স্টীল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন পরিচালিত বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতাল, কানোরিয়া জুট সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে গড়ে ওঠা শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উদ্যোগে গঠিত শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ। ঘটনাচক্রে কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্বে এই সব কটা আন্দোলনেই যুক্ত থেকেছি আমি।

কমরেড শংকর গুহ নিয়োগীর নেতৃত্বে ছত্তিশগড়ের শ্রমিক-স্বাস্থ্য আন্দোলন

১৯৭৭-এ দল্লী-রাজহরার ঠিকাদারী লোহাখনি-শ্রমিকদের ইউনিয়ন ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘকে নিয়োগী কেবল শ্রমিকের বেতন-বৃদ্ধি, বোনাস, চার্জশিটের জবাব লেখায় সীমিত রাখেন নি। শ্রমিক-জীবনের প্রত্যেকটা বিষয় স্থান পেয়েছিল ইউনিয়নের কর্মসূচীতে। ইউনিয়নের ১৭ টা বিভাগের অন্যতম ছিল স্বাস্থ্য বিভাগ।

১৯৭৯-এ ইউনিয়ন উপাধ্যক্ষা কুসুম বাই স্থানীয় ভিলাই স্টীল প্ল্যান্ট হাসপাতালে ডাক্তার ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রসবের সময়ে প্রাণ হারান। নেত্রীর মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা নিজেদের প্রসূতি হাসপাতাল গড়ার শপথ নেন।

'৮০-র দশকের শুরুতে এক সফল শরাব-বন্দী আন্দোলন চালায় ইউনিয়ন।

'স্বাস্থ্য কে লিয়ে সংঘর্ষ করো' আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৯৮১-র ১৫ই আগস্ট। ততদিনে ডা বিনায়ক সেন ও ডা আশীষ কুমার কুণ্ডু আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। ডা পবিত্র গুহ যোগ দেন মাস চারেক বাদে। আন্দোলনের প্রথম রূপ ছিল সাফাই আন্দোলন—শ্রমিকরা খনি-ম্যানেজমেন্টকে বাধ্য করে শ্রমিক বস্তি পরিস্কার রাখার বন্দোবস্ত করতে।

১৯৮২-র ২৬ শে জানুয়ারী শহীদ ডিস্পেন্সারীর কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৮৩-৩রা জুন ১৯৭৭-এর শহীদদের স্মৃতিতে গড়ে তোলা হয় শহীদ হাসপাতাল।

শহীদ হাসপাতাল 'মেহনতকশোঁ কে লিয়ে মেহনতকশোঁ কা আপনা কার্যক্রম' অর্থাৎ মেহনতী মানুষের জন্য মেহনতী মানুষের নিজস্ব কর্মসূচী।

■ শ্রমিকদের অর্থে ধীরে ধীরে গড়ে তোলা হয় এই প্রতিষ্ঠান।

■ খনি শ্রমিকরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখানে কর্মরত।

■ শ্রমজীবী পরিবারের ছেলে-মেয়েরা এই হাসপাতালের কর্মী।

■ হাসপাতাল পরিচালনায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের।

যুক্তিসঙ্গত ওষুধ ব্যবহার আন্দোলনের তাত্ত্বিক কথাগুলোর প্রথম বড় মাপের প্রয়োগ ঘটে এ হাসপাতালে —

■ টনিক, কাশির সিরাপ, এনজাইম, ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর ওষুধের ব্যবহার নেই।

■ অযৌক্তিক Fixed Dose Combination এর ব্যবহার নেই।

■ যেখানে ওষুধ ছাড়া কাজ চলে সেখানে ঘরোয়া ব্যবস্থাগুলোকে উৎসাহ দেওয়া হয় — কাশিতে গরম জলের ভাপ, ডায়রিয়ায় ঘরোয়া নুন-চিনির শরবৎ, জ্বর কমাতে জল দিয়ে মোছা...।

শহীদ হাসপাতাল জনশিক্ষার এক মাধ্যম রূপেও কাজ করে। যার উদ্দেশ্য —

■ রোগের আর্থ-সামাজিক কারণ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা।

■ রোগ-প্রতিরোধ ও রোগ-চিকিৎসার জ্ঞানে মানুষের ক্ষমতায়ণ করা।

দেওয়াল পত্রিকা 'স্বাস্থ্য সংগবারী', দ্বিমাসিক পুস্তিকা 'লোক স্বাস্থ্য শিক্ষামালা' এবং মোহল্লা-গ্রামে প্রচার—স্লাইড শো, পোস্টার প্রদর্শনী, ম্যাজিক শো, ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাস্থ্য-শিক্ষার কাজ চলত। জনসচেতনতা থেকে কি ভাবে জন-আন্দোলন গড়ে ওঠে তার অভিনব নির্দশন পাওয়া যায় এখানে — শুরু থেকে শহীদ হাসপাতালের প্রচারের বর্শামুখ ছিল ডায়রিয়ায় মৃত্যুর বিরুদ্ধে। এই প্রচারে জনসাধারণ ডায়রিয়া-প্রতিরোধে যথাযথ পানীয়

জলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হন। ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘ ও ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা এই সচেতন মানুষদের নিয়ে পানীয় জলের দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে তোলে তার চাপে ১৯৮৯-এ স্থানীয় প্রশাসন ও ভিলাই স্টীল প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষ দল্লী-রাজহরা ও তার আশেপাশের গ্রামগুলোতে ১৭৯টা নলকূপ বসাতে বাধ্য হয়।

স্বাস্থ্যের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক অবস্থার সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ তা বোঝা যায় শহীদ হাসপাতালের আরেকটা অভিজ্ঞতা থেকে। শহীদ হাসপাতাল শুরুর ৬ বছর পর ১৯৮৯-এ দল্লী-রাজহরার সরকারী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র শ্রমিক-বস্তিগুলোতে এক সমীক্ষা চালায়, তাতে দেখা যায় পোলিও-র সংখ্যা শূন্য। কারণ কেবল টীকাকরণ কর্মসূচী নয়। কারণ—ইউনিয়নের আন্দোলনের ফলে মজুরী বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বাসস্থানের উন্নয়ন, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বয়স্ক-শিক্ষাকর্মসূচীর ফলে বাবা-মায়েদের সচেতনতা।

শহীদ হাসপাতালের উপস্থিতির চাপে স্থানীয় ভিলাই স্টীল প্ল্যান্ট হাসপাতাল নিজের পরিষেবার উন্নয়ন ঘটাতে বাধ্য হয়, দল্লী-রাজহরায় একটা এবং ডোণ্ডী-লোহারা বিধানসভা ক্ষেত্রে সাতটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খুলতে বাধ্য হয় সরকার।

সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতি

শংকর গুহ নিয়োগী এক নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিলেন —

স্বপ্নের সমাজ
যেখানে সবাই পানীয় জল পাবে,
যেখানে সব খেতে সেচের ব্যবস্থা থাকবে,
যেখানে সব কর্মক্ষম হাত কাজ পাবে,
যেখানে কৃষক উৎপাদনের ন্যায্য দাম পাবে,
যেখানে সব গ্রামে হাসপাতাল থাকবে,
যেখানে সব শিশুর জন্য স্কুল হবে,
যেখানে সবাই পাবে বাস্তু জমি আর ঘর,
যেখানে দারিদ্র্য, শোষণ আর পুঁজিবাদ থাকবে না।

সেই স্বপ্নের সমাজের ছোট্ট একটা টুকরো সাকার শহীদ হাসপাতালে। সমাজের শ্রেণি-বিভাজন অনুযায়ী যে ক্ষমতার সিঁড়ি দেখা যায় যে কোন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে তা নেই এখানে। ডাক্তার থেকে সাফাই কর্মী সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেন নীতিগত ও প্রশাসনিক সব বিষয়ে। এর অনুপ্রেরণায় নতুন নতুন মানুষ নতুন সমাজের স্বপ্নের প্রতি আকৃষ্ট হন।

বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতাল

শহীদ হাসপাতালের অনুপ্রেরণায় ১৯৮৩-তে পথ চলা শুরু ইন্দো-জাপান স্টীল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও পিপলস হেলথ সার্ভিস এ্যাসোশিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে বেলুড় শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প-এর। খামারপাড়ার শ্রমিক-বস্তিতে প্রাথমিক স্কুলে চলে ক্লিনিক, স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রয়াস, সার্জিকাল ক্যাম্প।

১৯৯৪-এর ১লা মার্চ বেলুড় মঠের কাছে জি টি রোডের ওপর শ্রমজীবী হাসপাতালের শুরু। নানা প্রতিকূলতা জয় করে বেড়ে উঠেছে এ হাসপাতাল। অত্যন্ত কম খরচে শল্য চিকিৎসার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

শ্রীরামপুরের কাছে বেলুমিল্কি গ্রামে শ্রমজীবী হাসপাতালের বিশাল ভবন তৈরী হয়েছে। সম্প্রতি বোলপুরের কাছে কোপাই-এ ১০০ বিঘা জমিতে আরেকটা বিশাল শ্রমজীবী হাসপাতাল গড়ে উঠবে শোনা যাচ্ছে। এঁদের প্রধান সমস্যা উপযুক্ত সংখ্যায় চিকিৎসকের। এছাড়া বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতালের একটা বড় দুর্বলতা যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসার প্রতি যথাযথ দায়বদ্ধতার অভাব।

শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র

কানোরিয়া জুট সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে যাত্রা শুরু ১৯৯৫-এর ২০ শে মার্চ।

এলাকার কৃষিজীবী ও অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষের জন্য সংগঠিত শ্রমিকদের এ ছিল এক উপহার। চেঙ্গাইলের এক পরিত্যক্ত মুরগীর চালায় চলে প্রথম ৮ বছর। বিস্তীর্ণ এলাকার গরীব মানুষের আশা-ভরসার কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

২০০২-এর পরের আট বছরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তিনতলা ভবন। এখন ২৫ জন ডাক্তার, ১ জন ফিজিওথেরাপিস্ট, ১ জন অপ্টোমেট্রিস্ট, ২ জন সাইকোলজিস্ট, ২ জন স্পেশাল এডুকেটর, ২৯ জন অন্যান্য কর্মী। এক্স-রে, ইসিজি, প্যাথোলজি, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি হয় বাজারের কম খরচে। আছে কম খরচে

যুক্তিসঙ্গত ওষুধের দোকান।
সংগঠকরা এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গড়ে তুলেছেন এক মডেল হিসেবে, যে মডেল প্রমাণ করে খুব কম খরচে আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভবপর। যদি রোগীদের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস নেওয়া, সযত্ন শারীরিক পরীক্ষা করা হয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার এবং ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার করা হয়।

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ

শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এ সংগঠন গড়ে তোলেন ১৯৯৯-এ। মেহনতী মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার আন্দোলনে যুক্ত ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠন হিসেবে এ পরিচিতি পেয়েছে। এরা ডা নর্মান বেথুন, দ্বারকানাথ কোটনিস, বিজয় বসু, পুর্ণেন্দু ঘোষের পদাঙ্ক অনুসরণ করায় প্রয়াসী।

চিকিৎসাব্যবস্থার ব্যাপক ব্যবসায়ীকরণের স্রোতের বিরুদ্ধে এ সংগঠন প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, কম খরচে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিপূর্ণ আধুনিক চিকিৎসা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চেঙ্গাইল; বাউড়িয়া শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র; বাইনান শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র; মদন মুখার্জী স্মৃতি জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া এবং সুন্দরবন সীমান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা, জেমসপুর, গোসাবায় চালানো ক্লিনিকগুলোতে এই প্রমাণ করার কাজ চলে।

এ সংগঠন বিশ্বাস করে, যতই রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচী, জনস্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচী নেওয়া হোক না কেন, জনতার স্বাস্থ্যের অবস্থার সামান্যতম পরিবর্তনও হতে পারে না, যদি না স্বাস্থ্য কর্মসূচী খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, সংস্কৃতির আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকে।
তাই এ সংগঠন শ্রমজীবী মানুষের নায্য আন্দোলনের পাশে থাকার চেষ্টা করে— সিঙ্গুর জমিরক্ষার আন্দোলনে, নন্দীগ্রাম ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধে নন্দীগ্রাম গণহত্যাবিরোধী প্রচার মঞ্চ, নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য উদ্যোগ গড়ে তুলে, লালগড় আন্দোলনে, পস্কো-বিরোধী আন্দোলনে ....।
জনসাধারণকে রোগের আর্থসামাজিক কারণ সম্পর্কে জানানো এবং চিকিৎসা বিষয়টাকে ধোঁয়াশামুক্ত করে তাঁদের হাতে চিকিৎসার সহজ প্রযুক্তিগুলো তুলে দেওয়া এ সংগঠনের লক্ষ্য। নিজস্ব প্রকাশনা, অসুখ-বিসুখ পত্রিকা প্রকাশনায় অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকা প্রকাশনায় অংশগ্রহণ, গণ আন্দোলনের কর্মীদের স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে তৈরী করার কর্মসূচী চলে এই লক্ষ্যে। এ সংগঠন বিশ্বাস করে, দেশী-বিদেশী, সরকারী-বেসরকারী ফান্ডিং এজেন্সির অনুদানের ওপর নির্ভরতা নয়, জনতার উদ্যোগে তাঁদের সার্মথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে গড়ে ওঠা স্বনির্ভর কর্মসূচীই আসলে জনমুখী হতে পারে।
এ সংগঠন নিজের কর্মসূচীগুলোর রূপায়ণে চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মী এবং রোগীদের মধ্যে এমন সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়, যেমনটা হবে শোষণহীন নতুন সমাজে।

দক্ষিণবঙ্গে স্বাস্থ্যের অধিকারের স্বপক্ষে প্রচার, সবার জন্য স্বাস্থ্য-এর পক্ষে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে এ সংগঠন। শুরুটা হয়েছিল ২০১২-এ যোজনা কমিশন গঠিত সবার জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে উচ্চ-স্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল (High Level Expert Group on Universal Health Coverage) বা ডা শ্রীনাথ রেড্ডি কমিটির সুপারিশ বেরোনোর পর। এই সুপারিশে বলা হয় স্বাস্থ্যখাতে তৎকালীন সরকারী ব্যয় জিডিপি-র ১.৪% থেকে বাড়িয়ে দ্বাদশ যোজনার শেষে অর্থাৎ ২০১৭-র মধ্যে ২.৫% এবং ত্রয়োদশ যোজনার শেষে অর্থাৎ ২০২২ এর মধ্যে ৩% করা হোক। বিশেষজ্ঞ দল হিসেব করে দেখায় এতে দেশের সমস্ত নাগরিকের সমস্ত স্তরের চিকিৎসার ব্যয়-বহন সরকার করতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গে ২০১৩-র আরম্ভ থেকে এই কমিটির সুপারিশ নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু সংগঠন ও ব্যক্তি মিলে তৈরী করে পিপল ফল হেলথ কেয়ার। তাদের মধ্যে শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগই লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জনস্বাস্থ্য উদ্যোগ

সরবেড়িয়ার সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল, কামারহাটির জনসেবা ক্লিনিক, পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে ভালোপাহাড় স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকে আমাদের হাসপাতাল, পশ্চিম মেদিনীপুরের কুসুমাশুলি গ্রামে প্রেমসেবা হাসপাতাল আরও কিছু জনমুখী স্বাস্থ্য কর্মসূচী।

তিন ধরণের প্রয়াস জনস্বাস্থ্য আন্দোলনে

৮০-র দশকের শুরুতে দল্লী-রাজহরায় যখন 'স্বাস্থ্যের জন্য সংগ্রাম কর' আন্দোলন চলছে, ডাক্তাররা যোগ দিয়েছেন স্বাস্থ্য-কর্মসূচীতে, তখন বির্তক হয় — হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে না স্বাস্থ্য-সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করা হবে। সিদ্ধান্ত হয় হাসপাতালকে বিকল্পের মডেল হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি জন-সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ চালানো হবে।

আগে বলা স্বাস্থ্য আন্দোলনগুলোতে আমরা তিন ধরণের প্রয়াস দেখতে পাই ঃ -

১) স্বাস্থ্যের অধিকারের দাবিতে আন্দোলন, যে সামাজিক নির্ণায়কগুলো (Social Determinants) স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে (আর্থিক অবস্থা, জল, নিকাশী, কৃষি, খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ, শিক্ষা, গ্রামীণ উন্নয়ন, শহরের পরিকল্পনা, পরিবহন, যোগাযোগ, বাণিজ্য, পরিবেশ ইত্যাদি) সেগুলোর উন্নয়নের জন্য আন্দোলন বা আন্দোলনের জমি তৈরী করার জন্য জন-সচেতনতাবৃদ্ধি।

২) বিকল্পের মডেল তৈরী করা- বর্তমান ব্যবস্থার বিকল্প কি হতে পারে তার মডেল। এই মডেল মানুষকে বর্তমান ব্যবস্থা বদলের সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে।

৩) বর্তমান স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার মধ্যে থেকে সেটাকে জনমুখী করার চেষ্টা করা, সরকারের ঘোষিত সুযোগ-সুবিধাগুলো যাতে মানুষ পান তার জন্য চেষ্টা করা, বেসরকারী স্বাস্থ্যব্যবসায়ীদের ওপর আইনী শেকল পরানোর প্রয়াস, ইত্যাদি।

কোন আন্দোলন যদি তিন ধরণের কাজই করতে পারে তাহলে ব্যাপারটা পূর্ণাঙ্গ হয়। কিন্তু বাস্তবত কোন একটার ওপরই জোর পড়ে।

প্রথম ধরণের কাজ ভালোভাবে করা কেবল স্বাস্থ্য সংগঠনের পক্ষে সম্ভব নয়। বৃহত্তর সামাজিক সংগঠন যেমন ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সংগঠন, ইত্যাদির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করেই কেবল ফলপ্রসূ স্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। যেমনটা সম্ভব হয়েছিল ছত্তিশগড়ের শ্রমিক স্বাস্থ্য আন্দোলনে। বৃহত্তর সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক ছাড়া স্বাস্থ্য সংগঠন কেবল সীমিত ভাবে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজই করতে পারে।

বিকল্প মডেল তৈরী কাজ করেন যাঁরা তাঁদের এক ধরণের বিচ্যুতির শিকার হন প্রায়ই। মডেল তৈরী যে কেবল মানুষকে পরিবর্তনের সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করার জন্য তা ভুলে গিয়ে তাঁরা বড় বড় প্রতিষ্ঠান বানিয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নেওয়ার বিফল চেষ্টা করেন। তাই শহীদ হাসপাতাল বিশাল বিশাল বাড়ি বানাতে থাকে যেখানে যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসা মার খায়, বেতনে গণতান্ত্রিক পরিচালনার বদলে গতানুগতিক পরিচালন-ব্যবস্থা চলে। বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতাল বাইপাস অপারেশন শুরু করে, বাইপাস অপারেশন সফল ভাবে হতে না থাকলেও শুরু করে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, ডায়ালিসিস। ময় দানবের প্রাসাদের মতো শ্রীরামপুর শ্রমজীবী গড়ে তোলে। জায়গায় জায়গায় শ্রমজীবী হাসপাতাল খোলে নিজেদের সামর্থ্যের হিসেব না করেই শ্রমজীবী হাসপাতালগুলোতে ডাক্তার যোগানোর জন্য মেডিকেল কলেজ খোলার পরিকল্পনা করে, ছোট বেলা থেকে শিশুদের বাছাই করে তাদের কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার অবাস্তব পরিকল্পনা 'কেজি টু পিজি' করে। অথচ ছোট একটা হাসপাতাল বিকল্প মূল্যবোধ নিয়ে চালালে যে পর্যাপ্ত সংখ্যায় নতুন ডাক্তারকে আকৃষ্ট করা যায় তার উদাহরণ আছে একই জেলা অর্থাৎ হাওড়াতেই।

তৃতীয় ধরণের কাজ যাঁরা করেন, সর্তক না থাকলে ব্যবস্থা যে তাঁদের গিলে খায় সে কথা বলেছি MFC এবং জনস্বাস্থ্য অভিযান নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে।

জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের ফান্ডিং-নির্ভরতা

জনস্বাস্থ্য কর্মসূচীতে আরেকটা বিপজ্জনক ঝোঁক ফান্ডিং এজেন্সি-নির্ভরতা। ফান্ডিং এজেন্সি পয়সা দেয় জনসাধারণের মধ্যে কাজ করার জন্য, কি কাজ করা হবে তা ঠিক করে দেয় ফান্ডিং এজেন্সি, জনসমূদায়ের কোনটা প্রয়োজন তা সেখানে বিচার্য থাকে না। কর্মীরা স্বচ্ছল মাস-মাইনেতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন, গণ-আন্দোলন গণ-সংগঠনের আপাত কষ্টকর জীবনে তাঁরা কখনও আর কাজ করতে পারেন না। দেশের বড় জনস্বাস্থ্য কর্মসূচীগুলোর মধ্যে এখন ফান্ডিং-নির্ভর সংগঠনের দবদবা। গণতান্ত্রিক ভারতের জন্য গণতান্ত্রিক চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা কেমন হবে তা আলোচিত হয় কোনও বেসরকারী মেডিকেল কলেজের আতিথেয়তায়। ভারতের যেসব ডাক্তার চিকিৎসাব্যবস্থার

পণ্যায়ণের বিরুদ্ধে, তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজ হয় বিদেশী কোন ফান্ডিং এজেন্সির পয়সায়।

স্বাস্থ্যের অধিকারের লড়াইকে এগিয়ে নিতে জনমুখী স্বাস্থ্য কর্মসূচীগুলোর পারস্পরিক আদান-প্রদান চাই। এক আন্দোলন থেকে অন্য আন্দোলনের শিক্ষা নেওয়া চাই। স্বাস্থ্য আন্দোলনকে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের অঙ্গ করে তোলা চাই। মনে রাখা চাই হাজার জনস্বাস্থ্য কর্মসূচী দেশের সমস্ত নাগরিকের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে পারে না। দায়িত্ব নিতে হবে রাষ্ট্রকে। জনসাধারণকে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য'-এর দাবিতে সংগঠিত করাই স্বাস্থ্য সংগঠনগুলোর প্রধান কাজ হওয়া উচিত।

চিকিৎসা ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ চাই, যেমন বলেছিলেন ডা নর্মান বেথুন —

১) দেশের ডাক ও তার, সৈন্য ও নৌবাহিনীর, বিচার ও শিক্ষা বিভাগের মতো জনস্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্বও সরকারের।

২) সরকারকেই এর জন্য সমস্ত ব্যয় বহন করতে হবে।

৩) সকলের জন্য সমান চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে হবে। কে কত রোজগার করে তা না দেখে প্রত্যেকের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনমতো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। দান ও দাক্ষিণ্যের পাট তুলে দিয়ে ন্যায়-বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দয়া-দাক্ষিণ্য দাতাকে ছোট করে আর গ্রহীতার চরিত্রকে করে কলঙ্কিত।

৪) স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে যারা নিযুক্ত তাদের জন্য সরকারী তহবিল থেকে বেতন ও পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে একটা স্বায়ত্বশাসিত গণতান্ত্রিক চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও চিকিৎসাব্যবস্থার সামাজিকীকরণের জন্য সংগ্রাম ছাড়া পথ নেই।

(১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০১২ ফ্রেন্ডস অফ ডেমোক্র্যাসি আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্যের ঈষৎ বিস্তৃত রূপ)